স্বাধীনতা উত্তর পর্বে চটকল শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিবর্তনের ধারা : ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল (১৯৪৭ - ২০১১)

শত্রুঘ্ন কাহার

বাংলায় প্রথম চটকলটি গড়ে উঠেছিল হুগলী জেলার রিষড়ায় ১৮৫৫ সালে। পরবর্তী দুই দশকে চট শিল্পের প্রসার ঘটে দ্রুত। ফলে ১৮৯০ এর দশক থেকেই দলে দলে বিহার উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ থেকে অভিবাসী শ্রমিকেরা বাংলায় ভিড় করতে থাকে। প্রধানত অর্থনৈতিক কারনে তারা বাংলায় এলেও তাদের কমকান্ড শুধু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই সীমিত থাকেনি, বরং তা বাংলার সমাজ - সংস্কৃতি তথা রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। দীর্ঘ ১২০ বছর বাংলায় বসবাস করায় এই চটকল শ্রমিকদের এক নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাদের এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাকে কোনও বাঁধাধরা ছকে বিভক্ত করে আলোচনা করা সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন বাংলায় থাকা এবং আদি গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার দরুন উক্ত অঞ্চল গুলিতে এক মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব সহজেই অনুমেয়।

স্বাধীনতা উত্তর পর্বে এদের সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা বোঝার জন্য প্রাক স্বাধীনতা পর্বে বাংলার চটকল অধ্যুষিত অঞ্চল এদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফিরে দেখা উচিত। প্রধান অর্থনৈতিক কারনকে কেন্দ্র করেই তারা বাংলার অভিমুখে যাত্রা করায় তাদের অভিবাসনের প্রাথমিক পর্বে সাংস্কৃতিক বিবর্তন তেমন নজরে পড়ে না। বস্তুত এই সময় গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে ছিন্নমূল এক প্রাণীর মতই তারা বাংলায় বসবাস করতে থাকে। দ্বিতীয়ত যে কোনও সমাজে তার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হচ্ছে সেই সমাজের নারী। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে এই চটকল শ্রমিকরা সপরিবারে বাংলায় বসবাস করত না। তাদের পরিবার গ্রামে থাকায় চটকল অঞ্চলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতিফলন প্রথমপর্বে তেমন নজরে পড়ে না। আবার কিছু গ্রামীণ নারী এই সময় পর্বে চটকলের কাজে নিযুক্ত হলেও তারা ছিলেন গ্রামীন জীবনে পতি - পরিতক্তা , বিধবা নারী, যারা সবস্ব নিঃস্ব হয়ে বাধ্য হয়েছিল বাংলার চটকলে কাজ করতে। এই নারীদের চটকলের পুরুষ শ্রমিক ভালো চোখে দেখেনি। ফলে তারা সমাজে তেমন মর্যাদাও পায়নি। তৃতীয়ত যে কোনও সমাজে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসে তাদের শিক্ষা এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। প্রথম পর্বে গ্রাম থেকে ছিন্নমূল হয়ে যে সমস্ত অভিবাসী শ্রমিক চটকলে নিযুক্ত হয় তাদের প্রায় সকলেই ছিল নিরক্ষর। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যখন এই অভিবাসী শ্রমিকরা বাংলায় স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয় তখন এদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার ঘটে যা শ্রমজীবীদের নিজস্ব সংস্কৃতির

জন্ম দেয়। চতুর্থ প্রাক স্বাধীনতা কালে শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাদের ধার্মিক আচার অনুষ্ঠান। অমল দাসের প্রবন্ধ 'বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন' তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এই উৎসব - পার্বনকে কেন্দ্র করে ছুটির আবেদন এবং ছুটি আদায়ের জন্য জোরাল দাবি বা প্রতিবাদ তাদের জীবনে উৎসব পার্বনের গুরুত্বকেই তুলে ধরে।[৩] তবে প্রাক স্বাধীনতা পর্বে এই চটকল শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিবর্তনের ধারা ছিল মন্থর। কিন্তু কালক্রমে এই অভিবাসী শ্রমিকরা বাংলায় স্থায়ী শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে থাকলে এক পৃথক সাংস্কৃতিক জীবনের রূপরেখা ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকে।

বাংলার চটকল শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক জীবনে অন্যতম দিক হল তাদের ধর্মবিশ্বস ও আচার অনুষ্ঠান। প্রথমেই বলতে হয় এই চটকল শ্রমিকরা ছিল বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতি,ভাষা ও প্রদেশ থেকে আসা এক বৈচিত্রময় শ্রেণী। এদেরকে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক ঐক্যসূত্রে বেঁধে আলোচনা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষার লোক চটকলের একই ছাদের তলায় কাজ করলেও তাদের নিজ ভাষা ও ধর্মের প্রতি আস্থা ছিল গভীর । সম্ভবত গ্রাম থেকে ছিন্নমূলএই শ্রমজীবীদের জীবনে বেঁচে থাকার শেষ সম্বল ছিল তাদের এই ধর্ম ও ভাষা। সুতরাং এই ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে তাদের জীবনে নানান আচার অনুষ্ঠান।

প্রাক স্বাধীনতা পর্বে চটকলের মালিকরা চটকলের শ্রমিকদের জাত-পাতের বিচার থাকায় কুলি লাইনগুলিকে যতদূর সম্ভব সেভাবে ভাগ করে শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করত। এমনকি একাধিক সরকারি রিপোর্ট ও প্রতিবেদনে কুলি লাইনগুলিতে বিভিন্ন জাতের শ্রমিকদের পৃথক পৃথক ভাবে বসবাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'কুলি লাইনে' নিম্ন জাতের লোক ছাড়াও উচ্চ জাতের লোকও - যেমন ব্রাহ্মণ বাস করত। কোনও কোনও চটকলে জাতপাতের বিচার অত্যন্ত কঠোর ছিল।তবে কোম্পানি নির্মিত কুলি লাইনের সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমানে না থাকায় শ্রমিকরা প্রধানত চটকলের পাশ্ববর্তী এলাকায় সর্দারদের ভাঁড়া দেওয়া কুঁড়ে ঘরে বা বেসরকারি জমির মালিকদের নির্মিত বস্তিতে বাস করত। চটকল শ্রমিকরা সর্দারদের ভাড়া দেওয়া বস্তি বা কুঁড়ে ঘরে , মিল মালিকদের কুলি লাইন বা অন্যত্র বসবাস করলেও এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে তাদের সামাজিক মেলা মেশার ও সংযোগের বিভিন্ন স্থান ছিল। নানা উৎসব - পার্বনের সময় তারা চটকল পাশ্ববর্তী লোকালয়ে জমায়েত হত। বিভিন্ন উৎসবের সময় চটকল শ্রমিকরা মিল ম্যানেজারের কাছে ছুটির আবেদন করে তা আদায় করে নিত। ছুটি না দিলে অনেক সময় তারা বিক্ষোভ বা প্রতিবাদে ফেটে পড়ত।বাংলার চটকলের হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকগণ দুর্গাপূজা, দোল, রথযাত্রা, মহরম, ঈদ পালনের জন্য ছুটি দাবি করত।[৪]

স্বাধীতনা উত্তর পর্বে প্রথম দুই দশক তাদের ধার্মিক বিশ্বাস তথা আচার অনুষ্ঠানে তেমন কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। মূলত এ পর্বেও বিভিন্ন পুজো পার্বণকে কেন্দ্র করে ছুটির আবেদন করত এবং ছুটিতে বিহার উত্তরপ্রদেশ স্ব - গ্রামে পরিবারের সাথে পুজো উৎযাপন করত এই শ্রমজীবীরা। এই পুজো উৎযাপন ছাড়াও তাদের ধার্মিক বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই

বস্তি অঞ্চল জুড়ে একাধিক পুরনো মন্দির - মসজিদ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। প্রায় প্রত্যেক বস্তিতে একাধিক মন্দির লক্ষ্য করা যায়। আবার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে তাদের জন্য মসজিদ ও কবরখানার উপস্থিতি সহজে নজরে পড়ে। প্রধানত এই মন্দির মসজিদকে কেন্দ্র করেই তাদের দৈনন্দিন জীবনের ধর্ম বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আবার এই মন্দির - মসজিদকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দেখা যায়।[৫]

এই মন্দির মসজিদের পাশাপাশি বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এরা নিজ ধার্মিক বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদিতে যেমন সামাজিক সংযোগের পরিবেশ তৈরী করত তেমনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও এরা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হত। সপ্তাহে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, কারখানা ও কারখানার বাইরে দুর্বিষহ জীবন, এমনকি রবিবার দিনেও শ্রমিকদের কাছ থেকে জোর করে কাজ আদায় করে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী শ্রমিকদের ক্লান্ত ও বিষাদ গ্রস্ত করে তুলে ছিল।এই জীবন থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদ তাদের কাছে একান্ত ভাবে অনুভূত হত। উৎসব পার্বণে এই ছুটিছাটা তাদের অবসর উপভোগের সুযোগ এনে দিত। চটকলের বাঙালি হিন্দু শ্রমিকগন দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, দোল উৎসবের সময় তাদের বিভিন্ন সংগঠন ও গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলনের সুযোগ সুবিধা লাভ করত। নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় হত। শ্রমিকরা বিভিন্ন ব্যক্তি, দোকানদার ও শ্রমিকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করত এবং দুর্গাপূজার সময় মেলা, গান বাজনার আয়োজন করত। আবার তাদের গ্রামীণ পূজা অর্থাৎ ছটপুজোর সময় ছুটি নিয়ে গ্রামে যেত সপরিবারে ছটপুজো উৎযাপনের জন্য। ঠিক একই ভাবে ঈদ ও মহরম উৎসবের সময় মুসলমান শ্রমিকরা দলবদ্ধ ভাবে চটকলের পাশ্ববর্তী অঞ্চলে জড়ো হত। তাঁরা নিজেরা চাঁদা দিত, স্থানীয় মানুষজনের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করত। বাদ্যসহকারে মিছিল করত ও সকলে দলবদ্ধ ভাবে মিছিলে যোগদান করত। এই সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানকে মজবুত করার চেষ্টা করত। এই সামাজিক মিলন শ্রমিকদের ঐক্যবোধ এনে দিত, যা তাদের মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধর্মঘটে শক্তির উৎস স্বরূপ ছিল। অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকদের তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উৎসব অনুষ্ঠান পালনের জন্য সংযোগ ও সংহতির পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক চেতনা ও প্রতিদ্বন্দিতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সংকীর্ণ চেতনা ও প্রতিদ্বন্দিতা অনেক সময় হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করত।[৬]

সত্তরের এর দশক থেকেই এই চটকল শ্রমিকদের চরিত্রগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এরা ক্রমশ বাংলায় স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হতে থাকে। গ্রাম থেকে সপরিবার এই চটকল শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে চলে আসতে থেকে। গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন না হলেও ক্রমশ সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। ফলে এই অবাঙালিদের প্রধান পূজা 'ছটপূজা', 'জিতিয়া' ইত্যাদি বাংলায় উৎযাপিত হতে দেখা যায়। অন্যদিকে মুসলমানরাও ক্রমশ মসজিদ দরগাকে কেন্দ্র করে একত্রিত হতে থাকে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই চটকল শ্রমিকরা তাদের স্ত্রী ও পরিবারকে নিয়ে বাংলায স্থায়ী ভাবে বসবাস করার ফলেই তাদের পারিবারিক পূজা পার্বণে জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। অনেক

ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও চটকল শ্রমিকরা একাধিক পূজা পার্বণে ব্রতী হত। বস্তুত এই সময় পবে গ্রাম থেকে ছিন্নমূল এই চটকল শ্রমজীবীদের কাছে সামাজিক মর্যাদা অর্জন তথা বৃদ্ধির এক বিশেষ উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের এই আচার-অনুষ্ঠান ও পুজা-পার্বণ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বাংলার অন্যান্য সমস্ত পূজো পার্বণে এই অবাঙালি শ্রমজীবীরা অংশ গ্রহণ এদের নিজস্ব দুটি উৎসবের কথা এখানে আলাদা করে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলি তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিবর্তনের ছবি তুলে ধরে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় 'জিতিয়া' উৎসবের কথা। আজও বাঙালিদের কাছে এ উৎসব এক আতঙ্কের উৎসব। বস্তুত এই জিতিয়া উৎসবের সঙ্গে সংযুক্ত কিছু অপসংস্কারই তাদের কাছে আতঙ্ক বলে মনে হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন প্রবীণ চটকল শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা যায় তাদের সময় অর্থাৎ আজ থে কে ১০-২০ বছর আগে জিতিয়া উৎসবের আগের মধ্যরাতে এই হিন্দিভাষীদের ঘরের অল্প বয়স্ক ছেলেরা সম্মিলিত হয়ে রাস্তার আশে পাশে দোকান-পাট ঘর-বাড়ির দিকে ইট ও মাটির তৈরী ঢিল ছুড়তে ছুড়তে ও চিৎকার করতে করতে ঘুরে বেড়াত। ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলেঅধিবাসীদের বাড়ির কাঁচ, দোকানের সাটার উত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হত। সুতরাং এই উৎসবকে কেন্দ্র করে যে আর্থিক ক্ষতি হত তার জন্য বাঙালিদের সঙ্গে এই অবাঙালিদের মধ্যে এক সংঘর্ষে বাতাবরণ তৈরী হয়।[৭]

এই অপসংস্কৃতির বাইরে হিন্দিভাষীদের জীবনে এই উৎসবের এক বিশেষ, গুরুত্ব ছিল। বলতে হয় এই উৎসবের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই চটকল শ্রমজীবীদের বাড়ির মহিলারা। প্রধানত বিবাহিত মহিলারাই এই উৎসব পালন করত।ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন জানা যায় প্রায় সমস্ত অবাঙালি হিন্দিভাষীদের বাড়িতেই এই উৎসব হয়। উৎসবের দিন ভোর সকালে এই হিন্দিভাষী মহিলারা 'সরগি' অর্থাৎ কিছু অন্ন মুখে নিয়ে উৎসব আরম্ভ করে। উৎসবের দিন ও রাত বিনা অন্ন জলে ভগবানের কাছে পার্থনা করে নিজ স্বামী ও সন্তানদের জন্য দীর্ঘায়ু কামনা করে থাকে। বস্তুত এই উৎসবের দ্বারা তারা নিজ পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও নিজ পরিবারের মঙ্গল কামনা করে থাকে। উৎসবের পর দিন বাড়িতে ভালো মন্দ রান্ন বান্না করা হয় এবং এবং নিজ আত্মীয় স্বজনদের আমন্ত্রিত করে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া হয়। ফলে ৭০ এর দশক থেকে বৃহৎ পরিবারে যে বিভাজন দেখা যায় তা এই উৎসবের দ্বারা একে অপরের কাছে আসতে সক্ষম হয়।[৮]

জিতিয়া উৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালি হিন্দিভাষীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের বাতাবরণ তৈরী হলেও তাদের ওপর এক উৎসব 'ছটপূজা' কে কেন্দ্র করে এক পৃথক চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ছটপূজা বিহার ও উত্তরপ্রদেশের অন্যতম প্রধান পূজা স্বাধীনতা উত্তর প্রথম দুই দশক যখন এই শ্রমিকেরা সপরিবারে বাংলায় থাকত না তখন এই ছটপুজোকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে যেত পরিবারের সাথে এই উৎসব উৎযাপনে র জন্য। ৭০ এর দশক থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে, অনেক শ্রমিকই তাদের পরিবারকে নিয়ে আসে বাংলায় ফলে তাদের গ্রামীন জাবনের অন্যতম উৎসব ছটপুর্জা বাংলায় হতে শুরু করে। এই সময় পর্বে এই উৎসব এত জনপ্রিয় না বলেও কালক্রমে ইহা বাঙালি ও অবাঙালি উভয়ের মধ্যে অতি পরিচিত ও প্রিয় এক উৎসবের রূপ নিতে থাকে। চার দিন ধরে উৎযাপিত এই উৎসব কোনও অর্থেই বাংলার দুর্গোৎসবের চেয়ে

কম নয়।

চারদিন ধরে এই উৎসব পালন করা হয়। প্রথম দিন 'লাউ ভাত' নামে পরিচিত। এই দিন বাড়ির প্রত্যেক খাবারে অল্প বিস্তর লাউ এর ব্যবহার করা হয় এবং লাউ ভাত খাওয়ার মধ্য দিয়ে উৎসব আরম্ভ হয় । পরের দিন 'খরনা' নামে পরিচিত।এ দিন রাত ৭ টা থেকে ৮ টার মধ্যবর্তী সময় 'ছট মাতার' আরাধনা করা হয় এবং প্রসাদ হিসেবে মিষ্টি ভাত , রুটি ও কলা বিতরণ করা হয় ।উক্ত সময় পর্বে সমস্ত অঞ্চলে এক অদ্ভুত নীরবতা পালন করা হয়। পরের দিনকে বলা হয় 'পয়লা অর্ঘ্য' অর্থাৎ প্রথম অর্ঘ্য। এদিন তারা বিকেলে সূর্যাস্তের আগে মাথায় প্রসাদের থালা কাঁধে কলার কাঁধি নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গঙ্গায় যায় এবং সূর্য প্রণাম করে থাকে। চতুর্থ দিন 'দুসলা অর্ঘ্য' অর্থাৎ দ্বিতীয় অর্ঘ্য নামে পরিচিত। এদিন ভোর সকালে সূর্যোদয়ের আগে একই ভাবে মাথায় প্রসাদের থালা ও কাঁধে কলার কাঁধি নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গঙ্গায় যায় এবং সূর্যকে প্রণাম করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই উৎসবেও মহিলারাই থাকে প্রাণকেন্দ্রে। অত্যন্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সাথে চটকল শ্রমজীবিদের এই পুজা করতে দেখা যায়। প্রথম দিকে বাঙালিরা এই উৎসব সম্পর্কে তেমন উৎসাহ না দেখালেও পরবর্তীকালে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এই উৎসবের প্রসাদ বাঙালিদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। বর্তমানে 'ছটপুজা' ও 'ঠেকুয়া' বাঙালিদের কাছে প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে পড়েছে। সুতরাং এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালি ও হিন্দিভাষীদের মধ্যে এক সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়।[১০]

৯০ এর দশক থেকে চটশিল্পে ভাটা নেমে আসে, বিশ্বয়ানের প্রভাবে ছাটাই, লকআউট, ধর্মঘট চটকলের দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়। স্বাভাবিক ভাবে তাদের হাটতে হয় বিকল্প অর্থনীতির পথে। চটকলের সু সংগঠিত শ্রমিকরা ক্রমশ অসংগঠিত শ্রমিকে পরিণত হতে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক টানাপোড়েন তাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে তেমন স্পর্শ করতে পারেনি। উক্ত অঞ্চলগুলিতে পুজা-অর্চনা উৎসবের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে তাদের প্রচলিত উৎসবের পাশাপাশি 'মাতা কি জাগরণ', 'শিবচর্চা' ইত্যাদির প্রসার ঘটতে দেখা যায়। 'মাতা কি জাগরণ' একটি পাড়া বা কমিউনিটিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হলেও, শিবচর্চা প্রধানত মহিলাদের মধ্যে সংগঠিত হতে দেখা যায়। মুসলিমরা কোনও অংশে কম নেই। ঈদ, মহরম এর পাশাপাশি 'মিলাদ', 'জলসা'র মত ছোটো খাটো প্রোগ্রাম করতে থাকে। এগুলি দ্বারা সাধারণত তারা তাদের কমিউনিটিগত বন্ড বা সম্প্রদায়গত চেতনার বৃদ্ধি ঘটায়।[১১]

অন্যদিকে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান এই পর্বে আরও সুসংগঠিত রূপ নেয়। তবে উক্ত পর্বে এই চটকল শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে উৎসব পালনে যথেষ্ট সংযত হতে দেখা যায়। 'জিতিয়া' উৎসব পালনেও তার প্রতিফলন ঘটে। অল্প বয়স্ক ছেলেদের ইট ও মাটির তৈরি ঢিল ছোঁড়ার উৎপাত অনেকটা কমেছে, যদিও তা একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন ২০১৬-২০১৭ তে এই হিন্দিভাষীদর জিতিয়া উৎসবে উৎপাত থেকে বাঁচতে গারুলিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত ভিমের মোড় নামক বাঙালি এলাকার অধিবাসীরা নোয়াপাড়া থানায় একটি গণস্বাক্ষর (Mass Petitoon) জমা করেছিল বলে জানা যায়। উক্ত অঞ্চলে জিতিয়া উৎসবে

পুলিশরা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকে।[১২] অন্যদিকে ছটপুজার জাঁকজমক দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এই হিন্দিভাষী চটকল অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা লাইট দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। এর জন্য পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা সংগ্রহ চলে। আবার দেখা যায় প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ঘ্যের দিন রাস্তায় রাস্তায় হিন্দু, বাঙালি, মুসলিম সকলেই এই পূর্ণার্থীদের সেবায় ব্রতী থাকে। এরা সাধারণত মানত করে থাকে। এমনকি অনেক বাঙালি পরিবার ইদানিং ছটপুজায় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। পুজোর চারদিন আমিষ, রসুন-পেঁয়াজ ইত্যাদি শুধু এই হিন্দিভাষীরাই বর্জন করে চলে তাই নয় সমগ্র অঞ্চলে তা বর্জিত এমনকি উক্ত অঞ্চলের মুসলিম ও বাঙালিরাও কিছু দিনের জন্য আমিষ খাবার বন্ধ রাখে। হিন্দু, মুসলিম, বাঙালি নির্বিশেষে সকলে অতি উৎসাহে এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে তাকে। এই উৎসবের শ্রমজীবীদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় ২০১৫ সালে বাংলার রাজ্য সরকারের এই উৎসব উপলক্ষে দুই দিন সরকারি ছুটি ঘোষনার মধ্য দিয়ে। সুতরাং তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের 'জিতিয়া' ও 'ছটপুজা' এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল তা সহজে বোঝা যায়। আবার এই ছটপুজাকে কেন্দ্র করে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে এক সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যদিও এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চাহিদা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ছিল ।ছটপূজার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অধিকাংশ এই বাঙালিরাই সরবরাহ করতে দেখা যায়।[১৩]

হিন্দিভাষী হিন্দু ছাড়াও একাধিক জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এই চটকল শ্রমিক শ্রেণী। সুতরাং এই হিন্দু ও মুসলিমদের উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের বাইরেও একাধিক উৎসব পালন করতে দেখা যায় এই চটকল শ্রমিকদের। মাদ্রাজ শ্রমিকদের 'পোঙ্গল' ও ওনাম' উৎসবে মেতে উঠতে যেমন দেখা যায়, তেমনি পাঞ্জাবিদের 'বৈশাখী' ও গুরুনানকের জন্মবিদস উৎযাপন করতে দেখা যায়। তবে সময়ের সাথে সাথে এই উৎসব কোনও একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত না থেকে সমগ্র চটকল শ্রমজীবীদের এগুলিতে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। ফলে এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহবাসস্থানের মানসিকতাই ফুটে ওঠে এই শ্রমজীবীদের জীবনে। তবে এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা একেবারে শেষ হয়ে গেছে বলা যায় না। উক্ত অঞ্চলে আজও বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নজরে পড়ে।

টীকানির্দেশ

১) বি. ফলি, রিপোর্ট অন লেবার ইন বেঙ্গল (কলকাতা— ১৯০৬)

২) অমল দাস : ভারত ইতিহাসে নিম্নবগের নারী শ্রমিক উনিশ শতক থেকে বিশ শতক, পৃষ্ঠা নং- ৭২

৩) অমলদাস : বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন (১৮৭০ এর দশক থেকে ১৯২০ র দশক), অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৩, পৃষ্ঠা নং— ১১৩

৪) অমল দাস : তদেব

৫) ক্ষেত্রসমীক্ষা
৬) অমলদাস : তদেব
৭) ক্ষেত্রসমীক্ষা
৮) তদেব
৯) তদেব
১০) তদেব
১১) তদেব
১২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য
১৩) ক্ষেত্রসমীক্ষা